بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম। এতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি, ধ্বংস, ইহকালের সব প্রয়োজনীয় বিষয়, মৃত্যু, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সবকিছুই সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই যা ইসলামে আলোচনা করা হয়নি। ইসলাম সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে এ বিষয়গুলো আমরা জানতে পারব। এজন্য ইসলাম-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ইসলাম শিক্ষার পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক হওয়ায় একটি পুস্তক বা একটি শ্রেণিতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করা খুবই দুরূহ। এ শ্রেণিতে আকাইদ ও নৈতিক জীবন, শরিয়তের উৎস, ইবাদত, আখলাক ও আদর্শ জীবনচরিত শিরোনামে পাঁচটি অধ্যায়ে ইসলামের সুন্দর আদর্শ ও শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ ও নৈতিক জীবন

পরিচয়

আকাইদ শব্দটি আকিদা (عَقِيْدَةٌ) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ বিশ্বাসমালা। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকেই আকাইদ বলা হয়। ইসলাম আল্লাহ তায়ালার মনোনীত একমাত্র দীন বা জীবনব্যবস্থা। এর দুটি দিক রয়েছে। যথা- বিশ্বাসগত দিক ও আচরণগত বা প্রায়োগিক দিক। ইসলামের বিশ্বাসগত দিকের নামই হলো আকাইদ। আল্লাহ তায়ালা, নবি-রাসুল, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি আকাইদের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়গুলো কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত। মুসলিম হতে হলে সবাইকে এ বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। এরপর নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি প্রায়োগিক দিক তথা ইবাদত পালন করতে হয়। বস্তুত আকাইদের বিষয়গুলোর উপর বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে। এজন্য ইসলাম সম্পর্কে আলোচনার শুরুতেই আকাইদ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এ অধ্যায়ে আমরা সংক্ষেপে আকাইদ বা ইসলামি বিশ্বাসমালার কতিপয় মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- ইসলামের পরিচয় ও ইসলাম শিক্ষা পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক এবং ইমানের মৌলিক সাতটি বিষয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের প্রতি আস্থা স্থাপনে ও অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হব;
- তাওহিদে বিশ্বাসের প্রভাব ও মহান আল্লাহর পরিচয় বর্ণনা করতে পারব;
- তাওহিদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব;
- কুফর, শিরক ও নিফাকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব এবং এগুলোর পরিণতি ও তা পরিহার করে চলার উপায় বর্ণনা করতে পারব;
- বাস্তবজীবনে কুফর, শিরক ও নিফাক পরিহার করে চলব;
- মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;

- রিসালাত ও নবুয়তের ধারণা এবং নবি-রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারব;
- নবি-রাসুলগণের গুণাবলি, তাঁদের আগমনের ধারা, নবি-রাসুলের প্রতি বিশ্বাস ও তাঁদের অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- খতমে নবুয়তের ধারণা, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে রিসালাত ও নবুয়তের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস এবং এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে নিজের জীবনে রিসালাতের শিক্ষা বাস্তবায়নে আগ্রহী হব;
- আসমানি কিতাবের পরিচয় ও তৎপ্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- নৈতিক জীবন গঠনে আসমানি কিতাবের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, পরমত সহিষ্ণুতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে আল-কুরআনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- আসমানি কিতাবসমূহ ও কুরআন মজিদের পরিচয় জানব, বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে কুরআন পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ হব এবং তদনুযায়ী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, পরমতসহিষ্ণুতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন নৈতিক জীবনযাপন করব;
- আখিরাতের ধারণা ও বিশ্বাসের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- আখিরাতের জীবনের স্তরসমূহ- মৃত্যু, কবর, কিয়ামত, হাশর, বিচার, মিযান, পুলসিরাত, শাফাআত সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- জান্নাত ও জাহান্নামের পরিচয়, জান্নাত ও জাহান্নামের নাম, জান্নাত লাভের ও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের উপায় বর্ণনা করতে পারব;
- নৈতিক জীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব;
- আখিরাতে বিশ্বাস ও এর তাৎপর্য অনুধাবন করে পাপমুক্ত, সৎকর্মশীল, নীতিবান, মানবহিতৈষী ব্যক্তি হিসেবে জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত হব।

পাঠ ১

ইসলাম

পরিচয়

ইসলাম (اَلْاِسْلَامُ) আরবি শব্দ। আভিধানিক অর্থ হলো আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, শান্তির পথে চলা ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থে আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল (স.)-এর আনুগত্য করাকে ইসলাম বলে।

শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালার প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা, বিনা দ্বিধায় তাঁর যাবতীয় আদেশ নিষেধের আনুগত্য করা এবং তাঁর দেওয়া বিধান ও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দেখানো পথ অনুসারে জীবনযাপন করাকে ইসলাম বলা হয়।

একটি হাদিসে মহানবি (স.) সুন্দরভাবে ইসলামের মূল পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন-

اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ
وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

অর্থ: ইসলাম হলো– "তুমি এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। আর মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল, সালাত আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা পালন করবে এবং সামর্থ্য থাকলে বাইতুল্লাহর হজ আদায় করবে।" (বুখারি ও মুসলিম)

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে বহু আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান প্রেরণ করেছেন। এসব আদেশ-নিষেধ শরিয়ত হিসেবে প্রদান করেছেন। শরিয়তের সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো ইসলাম। এটি হলো মানবজাতির জন্য নির্দেশিত সর্বশেষ ও সর্বোত্তম জীবন বিধান। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে বলেন-

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯)

সুতরাং ইসলাম হলো আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম। আর যিনি ইসলাম অনুসারে জীবন পরিচালনা করেন তাকে বলা হয় মুসলিম বা মুসলমান।

ইসলামের ভূমিকা

ইসলাম হলো আল্লাহ তায়ালার প্রবর্তিত ধর্ম বা জীবন বিধান। এটি মানবজাতির জন্য আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ নিয়ামত। এটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের সকল বিষয় ও সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধানের দিকনির্দেশনা এতে দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۭ

অর্থ: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম; আর তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩)

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কাজকর্মের যথাযথ দিকনির্দেশনা ইসলামে বিদ্যমান। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ই ইসলামে যথাযথভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন বা পরকালের অবস্থার বর্ণনাও ইসলামে রয়েছে। সুতরাং সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামের বিকল্প নেই।

ইসলাম শব্দটি سِلْمٌ (সিলমুন) মূলধাতু হতে নির্গত, সিলমুন অর্থ শান্তি। ইসলাম মানুষকে শান্তির পথে পরিচালনা করে। ইসলামি বিধি-বিধান মেনে চললে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে পরিপূর্ণ শান্তিময় জীবন লাভ করতে পারে। এ জন্য ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলা হয়।

ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম। এটি কোনো কাল, অঞ্চল বা জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য ধর্মের নামকরণ সে সব ধর্মের প্রবর্তক, প্রচারক, অনুসারী কিংবা জাতির নামে করা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম হওয়ার কারণে এর নামকরণ কারও নামে করা হয়নি। বরং মহান আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের মাধ্যমে শান্তির পথে জীবন পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে এর নামকরণ করা হয়েছে ইসলাম।

ইসলাম-শিক্ষার গুরুত্ব

ইসলাম-শিক্ষা হলো ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। কোনো কিছু বাস্তবায়ন করতে হলে প্রথমে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হয়। যেমন সাঁতার কাটতে হলে প্রথমে সাঁতার কী, কীভাবে সাঁতার কাটতে হয় ইত্যাদি শিখতে হয়। গাড়ি চালাতে হলে গাড়ি ও গাড়ি চালনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। ঠিক তেমনি ইসলাম অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য ইসলাম সম্পর্কে প্রথমে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। আর এর প্রধান মাধ্যম হলো ইসলাম শিক্ষা।

ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত ও আনুগত্য শিখতে পারি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরা, উঠাবসা কীভাবে করতে হবে তা জানতে পারি। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, ক্ষমা, বিনয়, নম্রতা ইত্যাদি গুণের অনুশীলন করতে পারি। লোভ, হিংসা, মিথ্যাচার, অহংকার, পরনিন্দা ইত্যাদি খারাপ অভ্যাস পরিহার করে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারি। সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি ইত্যাদির মাধ্যমে সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করতে পারি। পরকালীন জীবনে জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় জানতে পারি। এককথায় ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও সফলতা লাভের দিকনির্দেশনা অর্জন করতে পারি।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ইসলামের পরিচয়, ভূমিকা ও ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ১৫টি বাক্য বাড়ি থেকে লিখে এনে শ্রেণি-শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ২
ইমান

পরিচয়

ইমান (اِيْمَانٌ) শব্দটি আমনুন (اَمْنٌ) মূল ধাতু থেকে নির্গত। যার অর্থ- বিশ্বাস করা, আস্থা স্থাপন, স্বীকৃতি দেওয়া, নির্ভর করা, মেনে নেওয়া ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করাকে ইমান বলে। ইমানের পরিচয় সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন-

اَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ

অর্থ: ইমান হচ্ছে- "আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ, রাসুলগণ, পরকাল এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের (ভালো-মন্দ আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকেই হয়) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।" (মুসলিম)

প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসকেই বলা হয় ইমান। ইমানের মৌলিক বিষয়গুলো আল্লাহর বাণী আল-কুরআন ও রাসুলুল্লাহ (স.)-এর পবিত্র হাদিসে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমানে মুফাস্সালে ইমানের মৌলিক বিষয়গুলো একত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

اٰمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ-

অর্থ: "আমি ইমান আনলাম আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবগুলোর প্রতি, তাঁর রাসুলগণের প্রতি, আখিরাতের প্রতি, তকদিরের প্রতি যার ভালো-মন্দ আল্লাহ্ তায়ালার নিকট থেকেই হয় এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।"

বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি সুদৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস ব্যতীত ইমানদার হওয়া যায় না। যিনি এগুলোতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাকে বলা হয় মুমিন।

ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক

ইমান ও ইসলাম দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। ইমান অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস,

মৌখিক স্বীকৃতি ও তদনুযায়ী আমল করাকে ইমান বলা হয়। অন্যদিকে ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ, আনুগত্য ইত্যাদি। মহান আল্লাহর যাবতীয় আদেশ নিষেধ বিনাদ্বিধায় মেনে নেওয়ার মাধ্যমে তাঁর প্রতি পূর্ণাঙ্গরূপে আত্মসমর্পণ করার নাম হলো ইসলাম।

ইমান ও ইসলামের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। এদের একটি ব্যতীত অন্যটি কল্পনাও করা যায় না। এদের একটি অপরটির উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক গাছের মূল ও শাখা-প্রশাখার মতো। ইমান হলো গাছের শিকড় বা মূল আর ইসলাম তার শাখা-প্রশাখা। মূল না থাকলে শাখা-প্রশাখা হয় না। আর শাখা-প্রশাখা না থাকলে মূল বা শিকড় মূল্যহীন। তদ্রূপ ইমান ও ইসলাম একটি অন্যটি ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ হয় না। ইমান মানুষের অন্তরে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, অনুরাগ ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের বাসনা সৃষ্টি করে। আর তাতে ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে সজীব ও সতেজ হয়ে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত হয় ইসলাম। ইসলাম হলো ইমানের বহিঃপ্রকাশ। ইমান হলো অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। আর ইসলাম বাহ্যিক আচার-আচরণ ও কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- আল্লাহ, রাসুল, ফেরেশতা ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস করা হলো ইমান। আর সালাত, যাকাত, হজ্ব ইত্যাদি বিষয় পালন করা হলো ইসলাম।

প্রকৃতপক্ষে, ইমান ও ইসলাম একটি অপরটির পরিপূরক। দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে হলে ইমান ও ইসলাম উভয়টিকেই পরিপূর্ণভাবে স্বীয় জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে।

ইমানের সাতটি মূল বিষয়

ইমান অর্থ বিশ্বাস। একজন মুসলিমকে ইমানের কতগুলো মৌলিক বিষয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হয়। এগুলো আল-কুরআন ও হাদিস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এ বিষয়গুলোতে বিশ্বাস ব্যতীত কেউই মুমিন বা মুসলিম হতে পারে না। এরূপ বিষয় মোট ৭টি। এগুলো হলো-

১. আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস

ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস। আল্লাহ্ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই। তিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। তিনি সকল গুণের আধার। তাঁর সত্তা ও গুণাবলি তুলনাহীন। সমস্ত প্রশংসা ও ইবাদত একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি এরূপ বিশ্বাস স্থাপন ইমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেশতাগণ মহান আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি। তাঁরা নুরের তৈরি। তাঁরা সবসময় আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত ও হুকুম পালনে নিয়োজিত। তাঁদের সংখ্যা অগণিত। তাঁরা নারীও নন, পুরুষও নন। তাঁরা পানাহার ও জৈবিক চাহিদা থেকে মুক্ত। তাঁদের প্রতি এরূপ বিশ্বাস রাখা ইমানের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস

আসমানি কিতাবসমূহ আল্লাহ্ তায়ালার বাণী। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে নিজ পরিচয় প্রদান করেছেন। নানা আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান, সুসংবাদ, সতর্কবাণী ইত্যাদিও এগুলোর মাধ্যমেই এসেছে। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রাসুলগণের নিকট এসব কিতাব পাঠিয়েছেন। দুনিয়াতে সর্বমোট ১০৪ খানা আসমানি কিতাব নাজিল করা হয়েছে। এ সমস্ত কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক।

৪. নবি-রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস

মানব জাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা যুগে যুগে বহু নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। নবি-রাসুলগণ ছিলেন আল্লাহ্ তায়ালার মনোনীত বান্দা। সকল সৃষ্টির মধ্যে তাঁরাই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ। আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশে তাঁরা মানব জাতিকে মহান আল্লাহর পথে ডেকেছেন, সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখিয়েছেন, ইহ ও পরকালীন শান্তি ও মুক্তির দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। নবি-রাসুলগণের প্রতি এরূপ বিশ্বাস রাখা ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৫. আখিরাতে বিশ্বাস

আখিরাত হলো পরকাল। আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। সেখানে মানুষকে দুনিয়ার জীবনের সকল কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। কবর, হাশর, মিযান, সিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি আখিরাত জীবনের এক একটি পর্যায়। দুনিয়াতে ভালো কাজ করলে মানুষ জান্নাত লাভ করবে। আর ইমান না আনলে, অসৎ কাজ করলে মানুষের স্থান হবে ভীষণ আযাবের স্থান জাহান্নাম।

আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

৬. তকদিরে বিশ্বাস

তকদির অর্থ হলো নির্ধারিত পরিমাণ, ভাগ্য বা নিয়তি। আল্লাহ তায়ালা মানুষের তকদিরের নিয়ন্ত্রক। তিনিই তকদিরের ভালোমন্দ নির্ধারণকারী। মানুষ যা চায় তা-ই সে করতে পারবে না। বরং মানুষ শুধু তার কাজের জন্য চেষ্টা সাধনা করবে। অতঃপর ফলাফলের জন্য আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করবে। যদি চেষ্টা করার পরও কোনো কিছু না পায় তবে হতাশ হবে না। আর যদি পেয়ে যায় তবুও খুশিতে আত্মহারা হবে না। বরং সবর (ধৈর্য) ধারণ করবে ও শোকর (কৃতজ্ঞতা) আদায় করবে। আর তকদিরের ভালোমন্দ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাতে, মনে প্রাণে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস

মৃত্যুর সাথে সাথেই মানুষের জীবন শেষ হয়ে যায় না। বরং মানবজীবন দু'ভাগে বিভক্ত। ইহকাল ও পরকাল। ইহকাল হলো দুনিয়ার জীবন। আর পরকাল হলো মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে মৃত্যুর পর আবার জীবিত করবেন। সে সময় সকল মানুষ হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। আল্লাহ তায়ালা সেদিন বিচারক হিসেবে মানুষের সকল কাজের হিসাব নেবেন। অতঃপর মানুষকে তার ভালো কাজের জন্য পুরস্কার স্বরূপ জান্নাতে ও মন্দকাজের শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। সুতরাং মৃত্যুর পর আমরা সবাই পুনরায় জীবিত হব এ বিশ্বাস রাখা ইমানের অপরিহার্য বিষয়।

কাজ : শিক্ষার্থী ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক বিষয়ে পাঁচটি বাক্য শ্রেণিকক্ষে বসে নিজ খাতায় লিখবে।

পাঠ-৩

মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের গুরুত্ব

ইমান অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাসকেই সাধারণত ইমান বলা হয়। আর মানবিক বলতে মানব সম্বন্ধীয় বুঝায়। অর্থাৎ যেসব বিষয় একমাত্র মানুষের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি হওয়ার যোগ্য তাই মানবিক মূল্যবোধ। অন্যকথায় যেসব কর্মকাণ্ড, চিন্তা-চেতনা মানুষ ও মানব সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাই মানবিক মূল্যবোধ।

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। এ হিসেবে মানুষের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও কর্মকাণ্ড সবই উন্নত ও সর্বোত্তম হওয়া উচিত। পশুর ন্যায় কাজকর্ম, লোভ-লালসা ইত্যাদি মানবিকতার আদর্শ নয়। যদি কোনো মানুষ এ আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে পশুর ন্যায় আচরণ করে তবে সে মানবিক মূল্যবোধকে বিনষ্ট করে। মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সমুন্নত রাখার জন্য উত্তম গুণাবলি ও আদর্শ অনুশীলনের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ রক্ষা করা যায়।

মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইমান নানাভাবে মানুষের মানবিকতার বিকাশ সাধন করে

থাকে। ইমানের মূলকথা হলো-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ)। অর্থ : "আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল।" এ কালিমার তাৎপর্য হলো আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও মাবুদ। তিনি ব্যতীত প্রশংসা ও ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি ব্যতীত আর কারও সামনে মাথা নত করা যাবে না। এ কালিমা মানুষকে আত্মমর্যাদাশীল করে। এ কালিমায় বিশ্বাসী ব্যক্তি শুধু আল্লাহ তায়ালার সামনে মাথা নত করে। পৃথিবীর অন্য কোনো সৃষ্টির সামনে মাথা নত করে না বা আত্মসমর্পণ করে না। ফলে মানুষের মর্যাদা সমুন্নত হয়, মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়।

ইমান মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালনা করে। নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই মানবিকতা ও নৈতিকতার ধারক হয়। অন্যায় অত্যাচার ও অনৈতিক কার্যকলাপ ইমানের সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্ণাঙ্গ মুমিন ব্যক্তি কখনোই মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের বিপরীত কাজ করতে পারে না। বরং মুমিন ব্যক্তি সবসময়ই নীতি-নৈতিকতা ও মানবিকতার আদর্শ অনুসরণ করে। সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি সৎগুণাবলির চর্চা করে।

কুফর, নিফাক, শিরক ইত্যাদি ইমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ সমস্ত বিষয় মানুষের মধ্যে অসৎ কার্যাবলির বিকাশ ঘটায়। এগুলোর প্রভাবে মানবসমাজে অকৃতজ্ঞতা, অবিশ্বাস, মিথ্যাচার, ওয়াদা খেলাপ, ঝগড়া-ফাসাদ, বিদ্রোহ ইত্যাদি জন্ম নেয়। যেমন মুনাফিক সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۝

অর্থ : "আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।" (সূরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত ০১)

ইমান মানুষকে নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে। মন্দ অভ্যাস ও অশ্লীল কার্যাবলি থেকে বিরত রাখে। ইমান মানুষকে দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহির ব্যাপারে সতর্ক করে। মুমিন ব্যক্তি সবসময় মনে রাখেন যে, তাঁকে একদিন আল্লাহ তায়ালার সামনে হাজির হতে হবে। সেদিন আল্লাহ তায়ালা সব কাজকর্মের হিসাব চাইবেন। অতএব এ জবাবদিহির ভয়ে মুমিন ব্যক্তি সব ধরনের অমানবিক ও অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۝ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ۝

অর্থ : "আর যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করে এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকে। নিশ্চয়ই জান্নাতই হলো তার বাসস্থান।" (সূরা আন-নাযিয়াত, আয়াত ৪০-৪১)

মানবিক মূল্যবোধ ও ইমান পারস্পরিক গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। ইসলামের মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে ব্যক্তি মুমিন হয়ে ওঠে। জীবনযাপনে সে নিজ খেয়ালখুশির পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনার অনুসারী হয়। ফলে সে সবধরনের অন্যায়, অবিচার ও অনৈতিকতা বাদ দিয়ে সুন্দর ও উত্তম আদর্শের অনুশীলন করে থাকে। এভাবে ইমান মানুষের মধ্যে মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়।

কাজ : শ্রেণিকক্ষে সব ছাত্র/ছাত্রী আলোচনা করে তিনজনকে বাছাই করবে। এ তিনজন 'মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের গুরুত্ব' বিষয়ে কী শিক্ষা লাভ করল তা বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে। শ্রেণির সব শিক্ষার্থী শ্রোতা হিসেবে শুনবে। শিক্ষক সভাপতি ও সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনজন বক্তার মধ্যে সবচেয়ে যে ভালো বক্তৃতা প্রদান করবে তাকে সবাই শুভেচ্ছা জানাবে।

পাঠ-৪
তাওহিদ

পরিচয়

তাওহিদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহিদ বলা হয়।

তাওহিদের মূল কথা হলো- আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে অদ্বিতীয়। তিনিই প্রশংসা ও ইবাদতের একমাত্র মালিক। তাঁর তুলনীয় কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ

অর্থ: "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।" (সূরা আশ্-শুরা, আয়াত ১১)

আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা ও ইবাদতের যোগ্য এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাসের নামই তাওহিদ।

তাওহিদের গুরুত্ব

ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো তাওহিদ। অর্থাৎ মুমিন বা মুসলিম হতে হলে একজন মানুষকে সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদে বিশ্বাস করতে হবে। তাওহিদে বিশ্বাস ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই ইমান বা ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না। ইসলামের সকল শিক্ষা ও আদর্শই তাওহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত। দুনিয়াতে যত নবি-রাসুল এসেছেন সকলেই তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। সকলের দাওয়াতের মূলকথা ছিল- لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বা আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তাওহিদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠার জন্য নবি-রাসুলগণ আজীবন সংগ্রাম করেছেন। হযরত ইবরাহিম (আ.) অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। আমাদের প্রিয়নবি (স.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছেন। বস্তুত, তাওহিদই হলো ইমানের মূল। ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

তাওহিদের প্রভাব

তাওহিদ হলো আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদে বিশ্বাস। মানব জীবনে এ বিশ্বাসের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। কেননা আল্লাহ তায়ালাই আমাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তাওহিদে বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষ এ সত্যকে স্বীকার করে নেয়। মানুষ এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করে।

তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদাবান করে। মানুষ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারও নিকট মাথা নত করে না। ফলে জগতের সকল সৃষ্টির উপর মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মর্যাদা লাভ করে।

সৎচরিত্রবান হওয়ার ক্ষেত্রেও মানবজীবনে তাওহিদের প্রভাব অপরিসীম। মানুষ আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি ও পরিচয় লাভ করে এবং সেসব গুণে গুণান্বিত হওয়ার অনুশীলন করে। মানব সমাজে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায়ও তাওহিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা তাওহিদে বিশ্বাস মানব সমাজে এ ধারণা প্রতিষ্ঠা করে যে, সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা ও সমান মর্যাদার অধিকারী। এভাবে মানুষের মধ্যে ঐক্যের চেতনা জাগ্রত হয়।

তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে ইবাদত ও সৎকর্মে উৎসাহিত করে। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষ সৎকর্মে ব্রতী হয়। অসৎ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে। ফলে মানব সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাওহিদে বিশ্বাস পরকালীন জীবনে মানুষকে সফলতা দান করে। তাওহিদে বিশ্বাস ব্যতীত কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। বস্তুত মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাওহিদে বিশ্বাস মুক্তি ও সফলতার দ্বার উন্মুক্ত করে।

কাজ : শিক্ষার্থী তাওহিদের পরিচয়, গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে নিজের অর্জিত ধারণা শিক্ষকের নিকট মৌখিকভাবে উপস্থাপন করবে। শিক্ষক তা মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ-৫

আল্লাহ তায়ালার পরিচয়

আল্লাহ তায়ালা এ বিশ্বজগতের অধিপতি ও মালিক। তিনি একক ও অদ্বিতীয় সত্তা। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি অনন্য ও অতুলনীয়।

'আল্লাহ' শব্দের মধ্যেই তাঁর তুলনাহীন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। اَللّٰهُ (আল্লাহ) আরবি শব্দ। পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই এ শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নেই। এর কোনো একবচন; বহুবচন নেই। এ শব্দের কোনো স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ নেই। এ শব্দটি একক ও অতুলনীয়। আল্লাহ তায়ালাও তদ্রূপ। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সমতুল্য বা সমকক্ষ কিছুই নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

অর্থ : "বলুন (হে নবি!) তিনিই আল্লাহ। একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।" (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত ১-৪)

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা। তিনি অনাদি অনন্ত। তিনি চিরস্থায়ী ও চিরবিরাজমান। তাঁর কোনো শুরুও নেই, শেষও নেই। তিনি পানাহার, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি সবকিছু থেকে মুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

অর্থ : "তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গোপন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।" (সূরা আল- হাদিদ, আয়াত ৩)

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ

অর্থ : "তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সর্বসত্তার ধারক। তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে কখনোই স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর অধীন।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৫)

আল্লাহ তায়ালা সকল গুণের আধার। সকল গুণ তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তিনি সৃষ্টিকর্তা। বিশ্বজগৎ ও এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর সৃষ্টি। তিনি রিযিকদাতা। সকল সৃষ্টিই রিযিকের জন্য তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনিই সর্বশক্তিমান সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। সকলকিছুই তাঁর পরিচালনায় সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এককথায় তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত। তাঁর গুণের কোনো সীমা নেই। সুন্দর ও পবিত্র নামসমূহ একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত। তাঁর কতিপয় গুণবাচক নাম হলো- রহিম (পরম করুণাময়), জাব্বার (প্রবল), গাফফার (অতি ক্ষমাশীল), বাসির (সর্বদ্রষ্টা), সামিউ (সর্বশ্রোতা), আলিউ (মহান), হাফিয (মহারক্ষক) ইত্যাদি।

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে এক ও অতুলনীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য, ইবাদতের যোগ্য সত্তা একমাত্র তিনিই।

পাঠ-৬
কুফর

পরিচয়

কুফর (اَلْكُفْرُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, ঢেকে রাখা, গোপন করা, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, অবাধ্য হওয়া ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটিরও প্রতি অবিশ্বাস করাকে কুফর বলা হয়।

কুফর হলো- ইমানের বিপরীত। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে বিশ্বাসের নাম ইমান। আর এসব বিষয়ে অবিশ্বাস করা হলো কুফর।

কাফির

যে ব্যক্তি কুফরে লিপ্ত হয় তাকে বলা হয় কাফির। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি ইসলামের কোনো মৌলিক বিষয়ে অবিশ্বাস করে তখন তাকে কাফির বলা হয়। কাফির অর্থ অবিশ্বাসী, অস্বীকারকারী। মানুষ নানাভাবে কাফির বা অবিশ্বাসী হতে পারে। যেমনঃ

ক. আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব অবিশ্বাস বা অস্বীকার করার দ্বারা। অর্থাৎ 'আল্লাহ নেই' এমন কথা বললে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে।

খ. আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি অস্বীকার করা। যেমন- আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা বা রিযিকদাতা না মানা।

গ. ইমানের মৌলিক সাতটি বিষয়ে অবিশ্বাস করা। যেমন- ফেরেশতা, নবি-রাসুল, আসমানি কিতাব, আখিরাত, তকদির ইত্যাদি অবিশ্বাস করা।

ঘ. ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলো অস্বীকার করা। যেমন- সালাত, যাকাত, সাওম, হজ্জ ইত্যাদিকে ইবাদত হিসেবে না মানা।

ঙ. হালালকে হারাম মনে করা। যেমন- হালাল খাদ্যকে হারাম মনে করে না খাওয়া।

চ. হারামকে হালাল মনে করা। যেমন- মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ ইত্যাদিকে হালাল বা জায়েজ মনে করা।

ছ. ইচ্ছাকৃতভাবে কাফিরদের অনুকরণ করা, তাদের ধর্মীয় চিহ্ন ব্যবহার করা।

জ. ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। যেমন, মহানবি (স.) কিংবা কুরআনকে নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করা।

উপরোল্লিখিত কাজগুলো করার মাধ্যমে মানুষ কাফির হয়ে যায়। এমতাবস্থায় পুনরায় ইমান আনতে ও খাঁটি মনে তওবা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ ঘৃণ্য কাজ না করার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে।

কুফরের পরিণতি ও কুফল

মানবজীবনে কুফরের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কুফরের ফলে শুধু দুনিয়াতেই নয় বরং আখিরাতেও মানুষকে শোচনীয় পরিণতি বরণ করতে হবে। এর কতিপয় কুফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক. অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা

কুফর মানুষের মধ্যে অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার জন্ম দেয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই আমাদের

লালন-পালন করেন। পৃথিবীর সকল নিয়ামত তাঁরই দান। কাফির ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালাকে অবিশ্বাস করে, এসব নিয়ামত অস্বীকার করে। সে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়। আল্লাহ্ তায়ালার বিধি-নিষেধ অমান্য করে। ফলে সমাজে সে অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হিসেবে পরিচিত হয়।

খ. পাপাচার বৃদ্ধি

কাফির ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালা, পরকাল, হাশর, মিযান, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি অবিশ্বাস করে। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে মানুষকে তার কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে এরূপ ধারণাও অস্বীকার করে। তার নিকট দুনিয়ার জীবনই প্রধান। সুতরাং দুনিয়ায় ধন-সম্পদের ও আরাম-আয়েশের লোভে সে নানারকম অসৎ ও অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ে। চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, সন্ত্রাস, সুদ-ঘুষ, জুয়া ইত্যাদিতে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে সমাজে পাপাচার বৃদ্ধি পায়।

গ. হতাশা সৃষ্টি

স্বভাবগতভাবেই মানুষ ভরসা করতে পছন্দ করে। আশা-ভরসা না থাকলে মানুষ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। কাফির ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালা ও তকদিরে অবিশ্বাস করে। ফলে সে যেকোনো বিপদে আপদে ধৈর্যহারা হয়ে পড়ে। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে ধৈর্যধারণ করতে পারে না। অন্যদিকে তকদিরে বিশ্বাস না থাকায় যেকোনো ব্যর্থতায় সে চরম হতাশ হয়ে পড়ে। ফলে তার জীবন চরম হতাশাগ্রস্তভাবে অতিবাহিত হয়।

ঘ. অনৈতিকতার প্রসার

কুফর মানবসমাজে অনৈতিকতার প্রসার ঘটায়। আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস না থাকায় কাফির ব্যক্তি নৈতিকতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে না এবং দুনিয়ার স্বার্থে মিথ্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার ইত্যাদি যেকোনো পাপ ও অনৈতিক কাজই সে বিনা দ্বিধায় করতে পারে। নবি-রাসুলগণকে বিশ্বাস না করায় তাঁদের নৈতিক চরিত্র এবং শিক্ষাও সে অনুসরণ করে না। এভাবে কুফরের মাধ্যমে সমাজে অনৈতিকতার প্রসার ঘটে।

ঙ. আল্লাহ্ তায়ালার অসন্তুষ্টি

কুফরির মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি অবিশ্বাস, অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা সৃষ্টি হয়। কাফির আল্লাহ্ তায়ালার বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধের কোনো পরোয়া করে না। বরং আল্লাহ্ তায়ালা, ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে বিদ্রোহ ও বিরোধিতা করে। ফলে আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। আর যার প্রতি আল্লাহ্ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন, সে যত ক্ষমতা ও সম্পদের মালিক হোক না কেন তার ধ্বংস অনিবার্য।

চ. অনন্তকালের শাস্তি

পরকালে কাফিররা জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

অর্থ : "যারা কুফরি করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৩৯)

কুফর একটি মারাত্মক পাপ। সুতরাং এ থেকে সকলেরই বেঁচে থাকা উচিত।

কাজ : শিক্ষার্থী কুফরের পরিণতি ও কুফল সম্পর্কে ১০টি বাক্য নিজ খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ-৭
শিরক

পরিচয়

শিরক (اَلشِّرْكُ) শব্দের অর্থ অংশীদার সাব্যস্ত করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা। ইসলামি পরিভাষায় মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে বলা হয় মুশরিক। শিরক হলো তাওহিদের বিপরীত। আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং শিরকের ধারণা খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন- قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

অর্থ : "বলুন (হে নবি!) তিনি আল্লাহ্, এক ও অদ্বিতীয়।" (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত ১)। অন্যত্র আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ

অর্থ : "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।" (সূরা আশ্-শুরা, আয়াত ১১)। আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে–

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

অর্থ : "যদি সেথায় (আসমান ও জমিনে) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।" (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ২২)

আল–কুরআনের এসব আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে আল্লাহ্ তায়ালার সত্তা ও গুণে অতুলনীয়তার বিষয়টি বোঝা যায়। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালার সাথে কাউকে অংশীদার করা নিঃসন্দেহে শিরক ও জঘন্য অপরাধ।

আল্লাহ্ তায়ালার সাথে শিরক চার ধরনের হতে পারে। যথা-

১. আল্লাহ্ তায়ালার সত্তা ও অস্তিত্বে শিরক করা। যেমন- ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র মনে করা।

২. আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলিতে শিরক করা। যেমন- আল্লাহ্ তায়ালার পাশাপাশি অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা বা রিযিকদাতা মনে করা।

৩. সৃষ্টি জগতের পরিচালনায় কাউকে আল্লাহর অংশীদার বানানো। যেমন- ফেরেশতাদের জগৎ পরিচালনাকারী হিসেবে মনে করা।

৪. ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করা। যেমন- আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে সিজদাহ্ করা, কারও নামে পশু জবাই করা ইত্যাদি।

শিরকের কুফল ও প্রতিকার

শিরক অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। পৃথিবীর সকল প্রকার জুলুমের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো শিরক। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۝

অর্থ : "নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম।" (সূরা লুকমান, আয়াত ১৩)

বস্তুত আল্লাহ্ তায়ালাই আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতই আমরা ভোগ করি। এরপরও কেউ যদি আল্লাহ্ তায়ালার সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে তবে তা অপেক্ষা বড় জুলুম আর কি হতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট। তিনি অপার ক্ষমাশীল ও অসীম দয়াময় হওয়া সত্ত্বেও শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত যেকোনো পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৪৮)

বস্তুত আল্লাহ তায়ালার দয়া, ক্ষমা ও রহমত ব্যতীত দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। পরকালে মুশরিকদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

অর্থ : "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে আল্লাহ তার জন্য অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দেবেন। এবং তার আবাস জাহান্নাম।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৭২)

প্রকৃতপক্ষে শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এরূপ কাজ থেকে সকলেরই সদাসর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। ভুলক্রমে আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরক করে ফেললে সাথে সাথে পুনরায় ইমান আনতে হবে। অতঃপর বিশুদ্ধ অন্তরে তওবা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সাথে সাথে ভবিষ্যতে এরূপ পাপ না করার শপথ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা স্বীয় দয়া ও করুণার মাধ্যমে পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন।

আমরা অবশ্যই শিরক থেকে বেঁচে থাকব এবং আল্লাহর উপর সুদৃঢ় ইমান এনে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হব। তাহলেই আমাদের ইহকাল ও পরকাল মঙ্গলময় হবে।

কাজ : শিক্ষার্থী শিরকের পরিচয়, কুফল ও প্রতিকার বিষয়ে ১০টি বাক্য বাড়ি থেকে পোস্টার আকারে তৈরি করে নিয়ে আসবে।

পাঠ-৮
নিফাক

পরিচয়

নিফাক শব্দের আভিধানিক অর্থ ভণ্ডামি, কপটতা, দ্বিমুখীভাব, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ইত্যাদি। এর ব্যবহারিক অর্থ হলো অন্তরে একরকম ভাব রেখে বাইরে এর বিপরীত অবস্থা প্রকাশ করা। অর্থাৎ অন্তরে বিরোধিতা গোপন রেখে বাইরে আনুগত্য প্রদর্শন করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, অন্তরে কুফর ও অবাধ্যতা গোপন করে মুখে ইসলামকে স্বীকার করার নাম হলো নিফাক। যে এরূপ কাজ করে তাকে বলা হয় মুনাফিক। মুনাফিকরা অন্তরের দিক থেকে কাফির ও অবাধ্য। কিন্তু বাহ্যিকভাবে তারা ইসলাম ও ইমান স্বীকার করে এবং মুসলিমদের ন্যায় ইবাদত পালন করে।

রাসুলুল্লাহ (স.) মুনাফিকদের চিহ্ন বর্ণনা করে বলেছেন-

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ- إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ-

অর্থ : "মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন কোনো কিছু তার নিকট আমানত রাখা হয় তার খিয়ানত করে।" (সহিহ্ বুখারি)

নিফাকের কুফল ও প্রতিকার

নিফাক একটি মারাত্মক পাপ। এটি মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে মানুষ মিথ্যাচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۝

অর্থ : "আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী।" (সূরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত ০১)

মিথ্যার পাশাপাশি মুনাফিকরা অন্যান্য খারাপ ও অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। পার্থিব লোভ-লালসা ও স্বার্থ রক্ষায় তারা মানুষের অকল্যাণ করতেও পিছপা হয় না। তারা পরনিন্দা ও পরচর্চা করে। ফলে সমাজে সন্দেহ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। মুনাফিকরা ভেতরে এক আর বাইরে অন্য রকম হওয়ায় লোকজন তাদের বিশ্বাস করে না। বরং সন্দেহ ও ঘৃণার চোখে দেখে। সমাজের মানুষের নিকট তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জীবন কাটায়।

ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মুনাফিকরা খুবই ক্ষতিকর। কেননা তারা মুসলমানদের সাথে মিশে ইসলামের শত্রুদের সাহায্য করে। মুসলমানদের গোপন তথ্য ও দুর্বলতার কথা শত্রুদের জানিয়ে দেয়। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর যুগেও মদিনাতে মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

তারা ইসলাম ও মুসলমানগণের সাথে থেকেও আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য ছিল। পরকালীন জীবনে মুনাফিকদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ

অর্থ : "নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৪৫)

আমরা নিফাক থেকে বেঁচে থাকব। আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের নিকট নিফাকের কুফল ও পরিণতির কথা তুলে ধরব ও তাদের সতর্ক করব। রাসুলুল্লাহ (স.) মুনাফিকদের যে তিনটি চিহ্ন বা নিদর্শনের কথা বলেছেন এগুলো থেকে আমরা অবশ্যই বেঁচে থাকব এবং নিজ জীবনে উত্তম চরিত্র অনুশীলন করব।

কাজ : শিক্ষার্থী মুনাফিকের চিহ্নগুলো লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ ৯
রিসালাত

পরিচয়

রিসালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ বার্তা, চিঠি পৌছানো, পয়গাম, সংবাদ বা কোনো ভালো কাজের দায়িত্ব বহন করা। ইসলামি পরিভাষায়, মহান আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণী মানুষের নিকট পৌছে দেওয়ার দায়িত্বকে রিসালাত বলা হয়। আর যিনি এ দায়িত্ব পালন করেন তাঁকে বলা হয় রাসুল। রাসুল শব্দের বহুবচন রুসুল।

রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

ইসলামি জীবনদর্শনে রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। তাওহিদে বিশ্বাসের সাথে সাথে প্রত্যেক মুমিন ও

মুসলিমকেই রিসালাতে বিশ্বাস করতে হয়। ইসলামের মূলবাণী কালিমা তায়্যিবাতে এ বিষয়টি সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। এ কালিমার প্রথমাংশ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; অর্থ- আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই) দ্বারা তাওহিদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আর সাথে সাথে দ্বিতীয়াংশ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ; অর্থ- মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল) দ্বারা রিসালাতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাওহিদে বিশ্বাস স্থাপনের ন্যায় রিসালাতেও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

বস্তুত রিসালাতে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন হতে পারে না। কেননা মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। এ স্বল্প জ্ঞান দ্বারা অনন্ত, অসীম আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। তাই নবি-রাসুলগণ মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাঁর পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা ও গুণাবলির বর্ণনা প্রদান করেছেন। তাঁরা ইহ ও পরকালীন কল্যাণের জন্য আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবনবিধান ও দিকনির্দেশনা নিয়ে এসেছেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) না আসলে নবি ও রাসুল সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না। এমনকি আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও সিফাতের পরিচয়ও লাভ করতে পারতাম না। মূলত নবি-রাসুলগণের আনীত বাণী ও বর্ণনার ফলেই মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং নবি-রাসুলগণের এ সমস্ত সংবাদ বা রিসালাতকে বিশ্বাস করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, রিসালাতকে অস্বীকার করলে মহান আল্লাহকেই প্রকারান্তরে অস্বীকার করা হয়। অতএব, মানবজীবনে রিসালাতে বিশ্বাস করা ইমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে নির্ধারিত।

নবি-রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য-অগণিত নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যহীনভাবে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়নি বরং তাঁরা নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁদের বেশ কিছু কাজ করতে হতো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় কাজ হলো-

- তাঁরা মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার পরিচয় তুলে ধরতেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার জাত-সিফাত, ক্ষমতা, নিয়ামত ইত্যাদি বিষয়ের কথা মানুষের নিকট প্রকাশ করতেন।
- সত্য ও সুন্দর জীবনের দিকে আহবান জানাতেন।
- আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও ধর্মীয় নানা বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন।
- পরকাল সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতেন।
- পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান বাস্তবায়নের জন্য হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন।

নবি-রাসুলগণের গুণাবলি

নবি-রাসুলগণ ছিলেন আল্লাহ তায়ালার মনোনীত বান্দা। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁদের নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝

অর্থ : "আল্লাহ্ তায়ালাই ফেরেশতাদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকেও রাসুল মনোনীত করেন; আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।" (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ৭৫)

সুতরাং মনোনীত বান্দা হিসেবে নবি-রাসুলগণ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। প্রথমত, তাঁরা ছিলেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাসী। সবধরনের কথায় ও কাজে তাঁরা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের অনুসরণ করতেন। আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ আনুগত্যই ছিল তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

নবি-রাসুলগণ ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সুবিবেচক ও বিচক্ষণ। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ। তাঁরা সবধরনের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র ছিলেন। স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের সকল প্রকার অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন। হযরত ইউসুফ (আ.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ নবি। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন," আমি তাঁকে মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত ২৪)

নবি-রাসুলগণ ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। সকল সৎগুণ তাঁরা অনুশীলন করতেন। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত সৎ, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ। দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য ইত্যাদি সব ধরনের মানবিক গুণ তাঁদের চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। মিথ্যা, প্রতারণা, পরনিন্দা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি খারাপ স্বভাবের লেশমাত্র তাঁদের চরিত্রে কখনোই ছিল না। বরং তাঁরা ছিলেন সৎস্বভাবের জন্য মানবজাতির অনুপম আদর্শ।

কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্বপালনে নবি-রাসুলগণ ছিলেন অতুলনীয়। নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁরা বিন্দুমাত্র অলসতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করেননি। বরং এজন্য কাফিরদের বহু অত্যাচার ও নিপীড়ন ধৈর্যসহকারে সহ্য করেছেন। কিন্তু তারপরও তাঁরা যথাযথভাবে মানুষের নিকট আল্লাহ্ তায়ালার বাণী পৌঁছিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন নির্লোভ ও নিঃস্বার্থ। পার্থিব কোনো লাভের আশায় তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব থেকে কখনো পিছপা হননি। কাফিররা ইসলামের দাওয়াত প্রচার বন্ধ করার জন্য তাঁদের নানা প্রলোভন দেখাত। কিন্তু তাঁরা পার্থিব স্বার্থের কাছে মাথা নত করেননি।

দীন প্রচারে নবি-রাসুলগণ ছিলেন ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। বিনা দ্বিধায় পার্থিব আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ তাঁরা আল্লাহর নির্দেশে ত্যাগ করতেন। দীন প্রচারের স্বার্থে প্রিয়নবি (স.) বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন, এমনকি নিজ দেশ মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। নবি-রাসুলগণের জীবনীতে ত্যাগের এরকম আরও অসংখ্য উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

নবুয়তের ধারা

আল্লাহ্ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। সর্বপ্রথম নবি ছিলেন হযরত আদম (আ.), আর সর্বশেষ নবি ও রাসুল হলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)। এঁদের মাঝখানে আল্লাহ্ তায়ালা আরও বহু নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। নবি-রাসুলদের আগমনের এই ধারাবাহিকতাকেই নবুয়তের ক্রমধারা বলা হয়। দুনিয়াতে আগত সকল গোষ্ঠী বা জাতির জন্যই আল্লাহ্ তায়ালা নবি-রাসুল বা পথপ্রদর্শনকারী পাঠিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

অর্থ : "আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই পথপ্রদর্শক রয়েছে।" (সূরা আর-রাদ, আয়াত ৭)

তাঁরা মানুষকে এক আল্লাহ তায়ালার দিকে ডাকতেন। সত্য ও সুন্দর জীবনবিধান তথা আল্লাহর দীন অনুসরণের নির্দেশ দিতেন।

সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত শরিয়ত তথা দীনের বিধি-বিধান এক রকম ছিল না। বরং মানবজাতির পরিবেশ, পরিস্থিতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন শরিয়ত দেওয়া হতো। নবি-রাসুলগণ তা মানবসমাজে বাস্তবায়ন করতেন। তবে সব নবি-রাসুলের দীনের মৌলিক কাঠামো ছিল এক ও অভিন্ন। আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ বা তাওহিদ ছিল সবারই প্রচারিত দীনের মূলকথা। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে আগত সকল নবি-রাসুলই এ দীন প্রচার করেছেন। হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহিম (আ.), হযরত মুসা (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত ঈসা (আ.) সকলেই এই একই দীন ও শিক্ষা প্রচার করেছেন। আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন নবুয়তের ধারার সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি আসেননি, আসবেনও না। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাধ্যমে দীনের পূর্ণতা প্রদান করেন। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

অর্থ : "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩)

এভাবে দীনের বিধি-বিধান পূর্ণতা প্রাপ্তির ফলে নবি-রাসুলগণের আগমনের ধারাও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নবুয়তের ধারাও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। মানুষের হিদায়াতের জন্য আগমনকারী এসব নবি-রাসুল সকলেই ছিলেন আল্লাহ তায়ালার মনোনীত বান্দা। তাঁদের সকলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟

অর্থ : "রাসুল, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ইমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। তাদের সবাই আল্লাহে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসুলগণে ইমান এনেছে। তারা বলে, আমরা তাঁর রাসুলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৮৫)

নবুয়তের ধারায় আগমনকারী সব নবি-রাসুলকে বিশ্বাস করা ইমানের অপরিহার্য শর্ত। এঁদের কাউকে বিশ্বাস এবং কাউকে অবিশ্বাস করা যাবে না। বরং সকলকেই আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত নবি-রাসুল হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। নবি-রাসুল হিসেবে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে। কারও প্রতিই কোনোরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ বা কটাক্ষ করা যাবে না।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি

নবুয়তের ধারার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ছিলেন আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)। তিনি ছিলেন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। দুনিয়াতে আগমনকারী সব নবি-রাসুলই কোনো বিশেষ গোত্র, বিশেষ দেশ, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য

দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সারা বিশ্বের সকল স্থানের সকল মানুষের নবি। তিনি বিশ্বনবি। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

অর্থ : "(হে নবি!) আপনি বলুন, হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্যই আল্লাহর রাসুল হিসেবে প্রেরিত।" (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১৫৮)

রাসুলুল্লাহ (স.) ছিলেন সর্বকালের নবি। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আগমন করবে সকলের নবি তিনিই। তাঁর শিক্ষা, আদর্শ ও আনীত কিতাব আল-কুরআন সকলকেই অনুসরণ করতে হবে। তিনি রহমতের নবি। মানবজাতির জন্য তিনি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নিয়ামত ও অনুগ্রহ স্বরূপ। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ○

অর্থ : "(হে নবি!) আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।" (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ১০৭)

অতএব, আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি। হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হিসেবে বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুসলমানের ইমানি কর্তব্য।

খতমে নবুয়তের অর্থ ও এতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশেষ নবি। তাঁর মাধ্যমে দীনের পূর্ণতা ঘোষিত হয় এবং নবুয়তের ধারা সমাপ্ত হয়। তিনি নবি-রাসুলগণের ধারায় সর্বশেষে আগমন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁকে 'খাতামুন নাবিয়্যিন' তথা সর্বশেষ নবি বলে অভিহিত করেছেন।

খাতামুন অর্থ শেষ, সমাপ্তি। আর নবুয়ত হলো নবিগণের দায়িত্ব। সুতরাং খতমে নবুয়তের অর্থ নবুয়তের সমাপ্তি। আর যার মাধ্যমে নবুয়তের ধারার সমাপ্তি ঘটে তিনি হলেন খাতামুন নাবিয়্যিন বা সর্বশেষ নবি।

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন হযরত আদম (আ.)। আর সর্বশেষ ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে নবি-রাসুলগণের আগমনের ধারা শেষ বা বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং তিনিই সর্বশেষ নবি বা খাতামুন নাবিয়্যিন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ط

অর্থ : "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবি।" (সূরা আল আহযাব, আয়াত ৪০)

খাতামুন শব্দের অন্যতম অর্থ সিলমোহর। কোনো কিছুতে সিলমোহর তখন অঙ্কিত করা হয় যখন তা পূর্ণ হয়ে যায়। সিলমোহর লাগানোর পর তাতে কোনো কিছু প্রবেশ করানো যায় না। নবুয়তের সিলমোহর হলো নবুয়তের পরিসমাপ্তির ঘোষণা। নবুয়তের দায়িত্বের পরিসমাপ্তি ঘোষণা। অর্থাৎ নতুনভাবে কোনো ব্যক্তি নবি হতে পারবে না এবং নবুয়তের ধারায় প্রবেশ করতে পারবে না। এটাই হলো খতমে নবুয়তের মূল কথা।

আমাদের প্রিয় নবি (স.) হলেন খাতামুন নাবিয়্যিন। তিনি সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি নেই। তাঁর পরে আজ পর্যন্ত কোনো নবি আসেননি। কিয়ামত পর্যন্ত আসবেনও না। তাঁর পরবর্তীতে যারা নবুয়ত দাবি করেছে তারা

সবাই ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। কেননা মহানবি (স.) বলেছেন,

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ

অর্থ : "আমিই শেষ নবি। আমার পরে কোনো নবি নেই।" (সহিহ মুসলিম)

অন্য একটি হাদিসে মহানবি (স.) বলেছেন- "অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। তারা প্রত্যেকেই নবি হওয়ার দাবি করবে। অথচ আমিই সর্বশেষ নবি। আমার পর আর কোনো নবি আসবে না।" (আবু দাউদ)

হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে খাতামুন নাবিয়্যিন হিসেবে বিশ্বাস করা ইমানের অন্যতম অঙ্গ। তাঁর পরবর্তীতে যারা নবি বলে দাবি করেছে সবাই মিথ্যাবাদী। আমরা তাদের নবি হিসেবে বিশ্বাস করব না। তাদের শিক্ষা, আদর্শ বর্জন করব।

আমরা জীবনের সর্বাবস্থায় মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ করে চলব।

কাজ : ক. শিক্ষার্থীরা রিসালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে ১০টি বাক্য নিজ খাতায় লিখবে।
খ. শিক্ষার্থীরা নবি-রাসুলগণের গুণাবলি সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ ১০
নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে রিসালাত ও নবুয়ত

ইসলাম নীতি-নৈতিকতার ধর্ম। ইসলামের সমস্ত আকিদা-বিশ্বাস, বিধি-বিধান, শিক্ষা-আদর্শ নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ইসলামি জীবনদর্শনে রিসালাত ও নবুয়ত অপরিহার্য বিষয়। নবুয়ত ও রিসালাত হলো নবি-রাসুলগণের দায়িত্ব। আল্লাহ্ তায়ালার বাণী ও শিক্ষা মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়াকে নবুয়ত ও রিসালাত বলা হয়। মানবজীবনে নৈতিক মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসারে নবুয়ত ও রিসালাত প্রধানত দুই ভাবে ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রথমত, নবুয়ত ও রিসালাতের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার অস্তিত্ব, পরিচয় ও গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা। মানুষকে সত্য ও সুন্দরের দিকে পরিচালনা করা। সর্বোপরি ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও সফলতার দিকনির্দেশনা প্রদান করা। নবুয়ত ও রিসালাতের শিক্ষা মানুষকে শান্তি ও শৃঙ্খলার দিকে পরিচালনা করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সকল কাজকর্ম আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশিত পথে পরিচালনা করতে সাহায্য করে। এভাবে দেখা যায়, যে ব্যক্তি নবুয়ত ও রিসালাতের শিক্ষানুসারে জীবনযাপন করে সেই পরিপূর্ণ মানুষ। এরূপ ব্যক্তি সমস্ত মানবিক গুণের অধিকারী হয়। পশুত্বের অভ্যাস ত্যাগ করে মনুষ্যত্বের অভ্যাস অনুশীলন করে। নবুয়ত ও রিসালাতের চেতনা মানুষের মধ্যকার সমস্ত খারাপ অভ্যাস, অশ্লীলতা ও মন্দকর্মের চর্চা দূর করে দেয়। মানুষ সৎ ও সুন্দর জীবনযাপনে উৎসাহিত হয়। উত্তম চরিত্র ও নৈতিক আচার-আচরণে উদ্বুদ্ধ হয়। এভাবে নবুয়ত ও রিসালাতের শিক্ষায় মানুষ নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়।

দ্বিতীয়ত, নবুয়ত ও রিসালাত মানুষকে নবি-রাসুলগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। নবি-রাসুলগণ ছিলেন নিষ্পাপ। তাঁরা ছিলেন সকল সৎগুণের অধিকারী। উত্তম চরিত্রের নমুনা ছিল তাঁদের জীবনচরিত। কোনোরূপ অন্যায়, অনৈতিক ও

অশ্লীল কাজকর্ম তাঁদের চরিত্রে কখনোই ছিল না। বরং সর্বাবস্থায় নীতি ও নৈতিকতার আদর্শ রক্ষা করাই ছিল তাঁদের অন্যতম দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ : "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আল-আহযাব, আয়াত ২১)

বস্তুত নবি-রাসুলগণ ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁদের জীবনী ও শিক্ষা আমাদের জন্য আদর্শ। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি। (ইবনে মাজাহ)

রাসুলুল্লাহ (স.) ছিলেন মানবতার মহান শিক্ষক। তিনি মানুষকে মানবতা ও নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদির নির্দেশনা প্রদান করেছেন। অত্যাচার, অবিচার ও অনৈতিকতার বদলে সত্য, ন্যায় ও মানবিকতার কথা বলেছেন। মানুষকে উত্তম চরিত্রবান হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। নিজ জীবনে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ অনুশীলনের মাধ্যমে হাতে কলমে মানুষকে নৈতিকতা সমুন্নত রাখতে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং বলেছেন-

اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ

অর্থ : "উত্তম গুণাবলির পরিপূর্ণতা দানের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।" (বায়হাকি)

বস্তুত নবি-রাসুলগণ সকলেই ছিলেন উত্তম আদর্শের নমুনা। আর আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম। তাঁর চরিত্রে মানবিক সবগুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

নবুয়ত ও রিসালাতে বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা ইসলামি জীবনদর্শনে প্রবেশ করি। অতঃপর নবি-রাসুলগণের জীবনী ও আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ কামনা করি। এভাবে আমাদের জীবন ও চরিত্র উত্তম হয়। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়। মানবসমাজে পশুত্বের পরিবর্তে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে।

কাজ : শিক্ষার্থী নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে রিসালাত ও নবুয়তের গুরুত্ব সম্পর্কে ১৫টি বাক্য নিজ খাতায় বাড়ি থেকে লিখে এনে শ্রেণি-শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১১

আসমানি কিতাব

পরিচয়

কিতাব শব্দের অর্থ লিপিবদ্ধ বা লিখিত বস্তু। এর প্রতিশব্দ হলো গ্রন্থ, পুস্তক, বই ইত্যাদি। আসমানি কিতাব হলো এমন গ্রন্থ যা আল্লাহ তায়ালা থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইসলামি পরিভাষায় যেসব কিতাব আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য দিকনির্দেশনা স্বরূপ নাজিল করেছেন তাকে আসমানি কিতাব বলে। অন্যকথায় আল্লাহ তায়ালার বাণী সম্বলিত গ্রন্থাবলিকে আসমানি কিতাব বলা হয়। সুতরাং আসমানি কিতাব হলো আল্লাহর বাণীসমষ্টি। আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে তাঁর বাণী রাসুলগণের নিকট প্রেরণ করেছেন। অতঃপর নবি-রাসুলগণ তা মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।

আসমানি কিতাবের বিষয়বস্তু

আল্লাহ্ তায়ালা আসমানি কিতাবসমূহে নানা বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। যেমন-

ক. আল্লাহ্ তায়ালার সত্তাগত পরিচয়।

খ. আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলির বর্ণনা।

গ. নবি-রাসুলগণের বর্ণনা।

ঘ. পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বিবরণ।

ঙ. অবাধ্য ও কাফিরদের পরিণতির বিবরণ।

চ. হালাল-হারামের বর্ণনা।

ছ. বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিবরণ।

জ. শাস্তি ও সতর্কীকরণ বিষয়ে আলোচনা।

ঝ. উপদেশ ও সুসংবাদ সম্পর্কে বিবরণ।

ঞ. আকিদা সংক্রান্ত বিষয়সমূহের বিবরণ।

ট. পরকাল সংক্রান্ত বিষয়সমূহের বিবরণ ইত্যাদি।

প্রসিদ্ধ আসমানি কিতাবসমূহ

আল্লাহ্ তায়ালা সর্বমোট ১০৪ খানা আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। এর মধ্যে ৪ (চার) খানা বড় ও প্রসিদ্ধ এবং ১০০ খানা ছোট কিতাব। ছোট কিতাবগুলোকে সহিফা বলা হয়। বড় চারখানা কিতাব চারজন প্রসিদ্ধ রাসুলের উপর নাজিল হয়। এগুলো হলো-

১. তাওরাত - হযরত মুসা (আ.)-এর উপর নাজিল হয়েছে।

২. যাবুর - হযরত দাউদ (আ.)-এর উপর নাজিল হয়েছে ।

৩. ইঞ্জিল - হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর নাজিল হয়েছে ।

৪. কুরআন - বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর নাজিল হয়েছে ।

আর ১০০ খানা সহিফা মোট চারজন নবির উপর নাজিল হয়। এঁরা হলেন-

১. হযরত আদম (আ.)। তাঁর উপর ১০ খানা সহিফা নাজিল হয়েছে ।

২. হযরত শিস (আ.)। তাঁর উপর ৫০ খানা সহিফা নাজিল হয়েছে ।

৩. হযরত ইবরাহিম (আ.)। তাঁর উপর ১০ খানা সহিফা নাজিল হয়েছে ।

৪. হযরত ইদরিস (আ.)। তাঁর উপর ৩০ খানা সহিফা নাজিল হয়েছে ।

আসমানি কিতাবে বিশ্বাসের গুরুত্ব

আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপন না করলে ইমানের মূল বিষয়ই নড়বড়ে হয়ে যায়। কেননা অসমানি কিতাবগুলোর মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ তায়ালা, নবি-রাসুল, ফেরেশতা, পরকাল ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পেরেছে। এসব বিষয় সম্পর্কে পবিত্র আল-কুরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি। যদি কেউ আসমানি কিতাবসমূহ ও তাতে বর্ণিত বিষয়সমূহে অবিশ্বাস করে তবে স্বভাবতই সে

ইমানের অন্যান্য বিষয়গুলোও অস্বীকার করে। সুতরাং ইমান আনার জন্য আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। অন্যথায় পূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না।

আসমানি কিতাবসমূহ হলো সকল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস। এর মাধ্যমেই আমরা সৃষ্টিজগৎ, মানবসৃষ্টি, পরকাল ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি। মানব জীবনে চলার পথ সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা আসমানি কিতাবসমূহেই পাওয়া যায়। আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাসই এসব বিষয়কে আমাদের বাস্তবজীবনে অনুশীলনের অনুপ্রেরণা দেয়।

সর্বশেষ আসমানি কিতাব 'আল-কুরআন'

আল-কুরআন আল্লাহ তায়ালার বাণী। মানবজাতির হিদায়াতের লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর এ কিতাব নাজিল করেন। আল-কুরআনই হলো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব।

নবি করিম (স.)-এর ৪০ বছর বয়সে হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন থাকাবস্থায় সর্বপ্রথম সূরা আলাকের প্রথম ৫টি আয়াত নাজিল হয়। এভাবে পবিত্র কুরআন নাজিল শুরু হয়। অতঃপর রাসুল (স.)-এর নবুয়তের ২৩ বছরে অল্প অল্প করে প্রয়োজন মাফিক সম্পূর্ণ কুরআন নাজিল হয়।

আল-কুরআন ৩০টি খণ্ডে বিভক্ত। এগুলোর প্রত্যেকটিকে এক একটি পারা বলা হয়। এর সূরা সংখ্যা ১১৪টি এবং রুকু সংখ্যা ৫৫৮টি।

কুরআনের নামকরণ

কুরআন অর্থ পঠিত। আল-কুরআন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রন্থ। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে বাধ্যতামূলকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ মহাগ্রন্থকে কুরআন বলা হয়।

কুরআনের অন্য অর্থ একত্র করা বা জমা করা। আল-কুরআনে পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের শিক্ষা ও মূলনীতি একত্র করা হয়েছে বিধায় একে কুরআন বলা হয়।

আল-কুরআনের বেশকিছু নাম রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ নাম-

১. আল-কিতাব (اَلْكِتَابُ)- গ্রন্থ।

২. আল-ফুরকান (اَلْفُرْقَانُ)- (সত্য-মিথ্যার) পার্থক্যকারী।

৩. আল-হিকমা (اَلْحِكْمَةُ)- জ্ঞান, প্রজ্ঞা।

৪. আল-বুরহান (اَلْبُرْهَانُ)- সুস্পষ্ট প্রমাণ।

৫. আল-হক (اَلْحَقُّ) - সত্য।

৬. আন-নুর (اَلنُّوْرُ) - জ্যোতি।

৭. আল-হুদা (اَلْهُدٰى) - পথনির্দেশ।

৮. আয-যিকর (اَلذِّكْرُ) - উপদেশ।

৯. আশ-শিফা (اَلشِّفَاءُ)- নিরাময়

১০. আল-মজিদ (اَلْمَجِيْدُ)- সম্মানিত, মহিমান্বিত।

১১. আল-মাওয়িযা (اَلْمَوْعِظَةُ)- সদুপদেশ।

১২. আর-রাহমাহ (اَلرَّحْمَةُ)- অনুগ্রহ, দয়া ইত্যাদি।

কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য

আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মর্যাদাবান গ্রন্থ। এটি দুনিয়ার সকল গ্রন্থ, এমনকি অন্যান্য আসমানি কিতাবের তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর সমকক্ষ আর কোনো কিতাব নেই।

আল-কুরআন পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব। এ গ্রন্থ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার। সব বিষয়ের মূলনীতি এ গ্রন্থে বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ

অর্থ : "আমি এই কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেই নি।" (সূরা আল-আনআম, আয়াত ৩৮)

সুতরাং আল-কুরআন হলো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের যথাযথ নির্দেশনা এ কিতাবে বিদ্যমান।

আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব। আল্লাহ তায়ালা মহানবি (স.)-এর মাধ্যমে ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ফলে পৃথিবীতে আর কোনো নবি-রাসুল আসবেন না। কোনো আসমানি কিতাবও নাজিল হবে না। কুরআনের শিক্ষাই কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তা ছাড়া পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের সার-নির্যাসও কুরআনে রয়েছে। সুতরাং এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব।

আল-কুরআন সন্দেহমুক্ত কিতাব। দুনিয়ার কোনো গ্রন্থই নির্ভুল বা অকাট্য নয়। কিন্তু কুরআন নির্ভুল এবং এটি সন্দেহেরও বাইরে। সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে এমন কোনো বিষয়ই এতে নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ

অর্থ : "এটি (কুরআন) সে কিতাব, যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২)

সর্বজনীন কিতাব হিসেবেও আল-কুরআনের মর্যাদা অনন্য। এটি কোনো দেশ, কাল বা জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং সকল যুগের সব মানুষের জন্য এটি উপদেশ ও পথনির্দেশক। সুতরাং এটি সর্বজনীন কিতাব। আল-কুরআন একমাত্র অবিকৃত গ্রন্থ। নাজিলের পর থেকে আজ পর্যন্ত এর একটি হরকত বা নুকতাও পরিবর্তিত হয়নি। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এর রক্ষক। তিনি বলেন-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○

অর্থ : "আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক।" (সূরা আল-হিজর, আয়াত ৯)

বস্তুত আল-কুরআন অবিকৃত ও অপরিবর্তিত গ্রন্থ। আজ পর্যন্ত এতে কোনোরূপ সংযোজন, সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন বা বিয়োজন হয়নি, আর ভবিষ্যতেও হবে না।

কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও মর্যাদাপূর্ণ কিতাব। এতে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য, ইতিহাস, ভবিষ্যদ্বাণী, বিজ্ঞান, সৃষ্টি রহস্য ইত্যাদি বিষয় খুব সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এটি যেহেতু আল্লাহ তায়ালার বাণী সুতরাং এর মর্যাদাও তাঁরই ন্যায় অতুলনীয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۝ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝

অর্থ : "বস্তুত এটি সম্মানিত কুরআন। সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।" (সূরা আল-বুরুজ, আয়াত ২১-২২)

আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। এটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও মহিমায় ভাস্বর। এটি পরিবর্তন, বিকৃতি, সংযোজন-বিয়োজন থেকে মুক্ত ও পবিত্র। এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব।

আমরা পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য অনুধাবন করব। ভক্তি ও সম্মান সহকারে আমরা কুরআন পাঠ করব এবং এর শিক্ষা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করে তা আমাদের বাস্তব জীবনে কার্যকর করব। কুরআনই হবে আমাদের জীবন চলার পাথেয়।

কাজ : ক. শিক্ষার্থী আসমানি কিতাবের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি তালিকা তৈরি করবে।
খ. শিক্ষার্থী পবিত্র কুরআনের ১০টি নামের একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ১২
নৈতিক জীবন গঠনে আসমানি কিতাবের ভূমিকা

পথহারা ও পথভ্রষ্ট মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসুলগণের মাধ্যমে যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাই আসমানি কিতাব। আসমানি কিতাব হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী ও বিধি-নিষেধের সমন্বিত গ্রন্থ। মানব জীবনকে নৈতিক ও আদর্শিক পথে পরিচালনা করতে আসমানি কিতাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আসমানি কিতাবগুলো মানুষকে আল্লাহ তায়ালার সত্তা, গুণাবলি, ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। তাছাড়া মানুষ আসমানি কিতাবের বর্ণনা দ্বারা পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান ও পরিচয় জানতে পারে। এসব বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে সত্য ও সুন্দর জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত করে।

আল্লাহ তায়ালা আসমানি কিতাবসমূহে বহু নবি-রাসুলের ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি তাঁদের অনুসারী পুণ্যবান ও মুমিনদের সফলতার কাহিনীও তুলে ধরেছেন। আসমানি কিতাবের মাধ্যমে মানুষ এসব কাহিনী ও ঘটনা জানতে পারে। তাঁদের সফলতা ও সম্মানের মূল চাবিকাঠি হিসেবে নৈতিকতার গুরুত্ব বুঝতে পারে। ফলে মানুষ নৈতিক জীবন গঠনে উৎসাহিত হয়। নবি-রাসুলগণের ঘটনার পাশাপাশি আসমানি কিতাবসমূহে কাফির, মুশরিক ও পাপাচারীদের ঘটনাও বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ করা হয়েছে এজন্য যে, মানুষ যেন এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করে। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল-কুরআনে ফিরআউন, নমরূদ, কারুন প্রমুখ নাফরমানের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আদ, ছামুদ ইত্যাদি পাপাচারী জাতিসমূহের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও আল্লাহ তায়ালার প্রতি অকৃতজ্ঞতা, অবাধ্যতা, গর্ব-অহংকার, পাপাচার, মিথ্যাচার, অনৈতিক ও অশ্লীল কার্যকলাপের দরুন তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা আমরা আসমানি কিতাবের মাধ্যমেই জানতে পারি। এসব ঘটনা আমাদের অনৈতিক ও অন্যায় কার্যাবলি থেকে বিরত থাকতে এবং সৎ ও মানবিক জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করে।

জ্ঞান বা শিক্ষা হলো এক প্রকার আলো। এটি মানুষের অন্তর চক্ষুকে খুলে দেয়। শিক্ষিত মানুষ ব্যর্থতার কারণ ও সফলতার সোপান সম্পর্কে অবগত থাকে। সুশিক্ষিত মানুষ নৈতিক ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয় এবং ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে শান্তি ও সফলতা লাভ করে থাকে। আসমানি কিতাব মূলত জ্ঞানের সর্বোত্তম উৎস। আসমানি কিতাব মানুষকে সবধরনের কল্যাণের পথনির্দেশ করে। আল-কুরআন প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

অর্থ : "এটি সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটি মুত্তাকিদের জন্য পথনির্দেশক।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ০২)

আল-কুরআন হলো সকল জ্ঞানের আধার। মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূলনীতি ও সারকথা এ গ্রন্থে নির্ভুলভাবে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে আল-কুরআনের শিক্ষা মানুষকে সুশিক্ষিত করে তোলে ও নৈতিকতা বিকাশে সহায়তা করে।

আসমানি কিতাবসমূহে মানুষকে নীতি-নৈতিকতার আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব গ্রন্থে উন্নত আদর্শ ও সৎগুণাবলির নানা বিষয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি যেসব কাজ ও অভ্যাসের দ্বারা নৈতিক জীবনাচরণ লঙ্ঘিত হয় সে সম্পর্কে সতর্ক ও নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ইত্যাদি কিতাব পাঠ করলেও মানবিকতার বহু দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার পর থেকে অন্য কিতাবগুলোর কার্যকারিতা রহিত করা হয়েছে। সর্বোপরি আল-কুরআনে নীতি-নৈতিকতার পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা রয়েছে। এ কিতাব অনুসরণে জীবন পরিচালনা করলে মানব জীবন নীতি-নৈতিকতামণ্ডিত সুন্দর ও শান্তিময় হয়।

কাজ : শিক্ষার্থী নৈতিক জীবন গঠনে আসমানি কিতাবের ভূমিকা সম্পর্কে ১০টি বাক্য খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৩

আখিরাত

পরিচয়

আখিরাত অর্থ পরকাল। মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলা হয়। মানবজীবনের দুটি পর্যায় রয়েছে। ইহকাল ও পরকাল। ইহকাল হলো দুনিয়ার জীবন। আর মৃত্যুর পরে মানুষের যে নতুন জীবন শুরু হয় তার নাম পরকাল বা আখিরাত।

আখিরাত অনন্তকালের জীবন। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। এটি মানুষের চিরস্থায়ী আবাস। আখিরাতে মানুষের দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। অতঃপর ভালো কাজের পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত এবং মন্দ কাজের জন্য জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে।

আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

আখিরাত ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামি জীবনদর্শনে আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য। এ বিশ্বাসের গুরুত্বও অপরিসীম। আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মুমিন ও মুত্তাকি হওয়া যায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

অর্থ : "আর তারা (মুত্তাকিগণ) আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৪)

তাওহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাসের পাশাপাশি আখিরাতেও বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যক। আখিরাতে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন বা মুসলিম হতে পারে না। পরকালীন জীবনের সফলতা ও জান্নাত লাভ করার জন্যও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আখিরাতে বিশ্বাস না করলে মানুষ সত্যপথ থেকে দূরে সরে যায়, পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۝

অর্থ : "আর কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি অবিশ্বাস করলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৩৬)

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং পুণ্য কাজ করতে উৎসাহ যোগায়। কেননা আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি জানে যে, পরকালে তাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, দুনিয়ার সব কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। ফলে বিশ্বাসী ব্যক্তি দুনিয়াতে সৎকাজে উৎসাহিত হয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকে। এভাবে মানুষ অসৎচরিত্র বর্জন করে সৎচরিত্রবান হয়ে ওঠে। অপরদিকে আখিরাতে যে অবিশ্বাস করে সে সুযোগ পেলেই পাপাচার ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কেননা সে পরকালীন জবাবদিহিতে বিশ্বাসী নয়। এভাবে আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস মানবসমাজে অত্যাচার ও পাপাচার বৃদ্ধি করে। আখিরাতে বিশ্বাসী মানুষ কখনো পাপাচার ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হতে পারে না।

অন্যদিকে, আখিরাতে বিশ্বাস মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি মানবজীবনকে কলুষমুক্ত, পবিত্র ও সুন্দর করে তোলে।

অতএব, আমরা আখিরাতের প্রতি দৃঢ় ইমান আনব এবং আখিরাতে মুক্তির জন্য সৎ ও সুন্দর কাজ করব এবং ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণ করে জীবন-যাপন করব।

পাঠ ১৪

আখিরাতের জীবনের কয়েকটি স্তর

আখিরাত হলো পরকাল। মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলে। এ জীবন চিরস্থায়ী ও অনন্ত। এ জীবনের কোনো শেষ নেই। আখিরাত বা পরকালের বেশ কয়েকটি স্তর বা পর্যায় রয়েছে। এ পাঠে আমরা সংক্ষেপে আখিরাতের বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় সম্পর্কে জানব।

ক. মৃত্যু

আখিরাত বা পরকালীন জীবনের শুরু হয় মৃত্যুর মাধ্যমে। সুতরাং মৃত্যু হলো পরকালের প্রবেশদ্বার। আল্লাহ তায়ালা সকল প্রাণীর মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি বলেন-

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ط

অর্থ : "প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।"(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮৫)

দুনিয়ার কোনো প্রাণীই মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে না। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, সুস্থ-অসুস্থ, শাসক-শাসিত কেউই মৃত্যুকে এড়াতে পারবে না। যত বড় ক্ষমতাধারীই হোক আর যত সুরক্ষিত স্থানে বসবাস করুক সবার নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যু হবেই। এ ছাড়াও অন্যান্য প্রাণীরও মৃত্যু অনিবার্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ

অর্থ : "তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৭৮)

মৃত্যুর সাথে সাথে আখিরাতের জীবন শুরু হয়। পুণ্যবান মানুষের মৃত্যু হয় আল্লাহ তায়ালার রহমতের সাথে। আর পাপীদের মৃত্যু খুব কষ্টকর হয়।

খ. কবর

মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়কে কবরের জীবন বলা হয়। এর অপর নাম বারযাখ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

অর্থ : "আর তাদের সামনে বারযাখ থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।" (সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত ১০০)

দুনিয়াতে মানুষকে মৃত্যুর পর কবরস্থ করা হয়। এসময় মুনকার-নাকির নামক দুজন ফেরেশতা কবরে আসেন। তাঁরা মৃত ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন করেন। এগুলো হলো-

১। مَنْ رَّبُّكَ ؟ - তোমার রব কে?

২। وَمَا دِيْنُكَ ؟ - তোমার দীন কী?

৩। وَمَنْ نَّبِيُّكَ ؟ - তোমার নবি কে? অথবা, وَمَنْ هٰذَا الرَّجُلُ ؟ (রাসুল (স.) এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়) এই ব্যক্তি কে?

যাদের কবর দেওয়া হয় না তাদেরও এ প্রশ্ন করা হবে। দুনিয়াতে যারা ইসলাম অনুসারে জীবন পরিচালনা করবে তারা এ প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে পারবে। তাদের জন্য কবরের জীবন হবে শান্তিময়। আর যারা ইসলাম অনুসরণ করবে না তারা এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না। তারা বলবে 'আফসোস। আমি জানি না।' কবরের জীবনে তারা কঠোর শাস্তি ভোগ করবে।

গ. কিয়ামত

আকাইদ শাস্ত্রে কিয়ামত বলতে দুটি অবস্থাকে বোঝানো হয়।

প্রথমত : কিয়ামত অর্থ মহাপ্রলয়। আল্লাহ তায়ালা এ গোটা বিশ্ব মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষকে তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন । কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন গোটা বিশ্বে মহান আল্লাহর ইবাদত করার মতো কেউ থাকবে না। এমনকি আল্লাহ নাম নেওয়ার মতোও কাউকে পাওয়া যাবে না। সকল মানুষ গোমরাহি ও নাফরমানিতে

লিপ্ত হয়ে পড়বে। সেসময় আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবী ধ্বংস করে দেবেন। তাঁর নির্দেশে হযরত ইসরাফিল (আ.) শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। ফলে চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজি খসে পড়বে, পাহাড় পর্বত তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে, ভূগর্ভস্থ সবকিছু বের হয়ে যাবে, সকল প্রাণী মৃত্যু বরণ করবে এবং গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এ সময় শুধু আল্লাহ তায়ালা থাকবেন। আর কেউ বিদ্যমান থাকবে না। পৃথিবী ধ্বংসের এ মহাপ্রলয়ের নাম কিয়ামত।

দ্বিতীয়ত : কিয়ামতের অন্য অর্থ দাঁড়ানো। পৃথিবী ধ্বংসের বহুদিন পর আল্লাহ তায়ালা আবার সকল জীব ও প্রাণীকে জীবিত করবেন। আল্লাহর নির্দেশে ইসরাফিল (আ.) পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। তখন মানুষ পুনরায় জীবিত হয়ে কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানে হিসাব নিকাশের জন্য সমবেত হবে। ঐ সময়ে কবর থেকে উঠে দাঁড়ানোকে বলা হয় কিয়ামত। একে 'ইয়াওমুল বা'আছ' বা পুনরুত্থান দিবসও বলা হয়।

কিয়ামতের এ উভয়বিধ অবস্থা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ ○

অর্থ : "আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। ফলে যাদের আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই মূর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।" (সূরা আয্-যুমার, আয়াত ৬৮)

ঘ. হাশর

হাশর হলো মহাসমাবেশ। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে সকল মানুষ ও প্রাণীকুল মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে। সকলেই সেদিন একজন আহবানকারী ফেরেশতার ডাকে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। এ ময়দান বিশাল ও সুবিন্যস্ত। পৃথিবীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষই সেদিন এ মাঠে একত্রিত হবে। মানুষের এ মহাসমাবেশকেই হাশর বলা হয়।

হাশরের ময়দান হলো হিসাব নিকাশের দিন, জবাবদিহির দিন। এদিন আল্লাহ তায়ালা হবেন একমাত্র বিচারক। আল্লাহ তায়ালা বলেন- مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○

অর্থ : "তিনি (আল্লাহ) বিচার দিবসের মালিক।" (সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত ৩)

সেদিন সকল মানুষের সমস্ত কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। হাশরের ময়দানে মানুষের আমলনামা দেওয়া হবে। যাঁরা পুণ্যবান তারা ডান হাতে আমলনামা লাভ করবেন। আর পাপীরা বাম হাতে আমলনামা পাবে।

হাশরের ময়দান ভীষণ কষ্টের স্থান। সেদিন সূর্য মাথার উপর একেবারে নিকটে থাকবে। মানুষ প্রচণ্ড তাপে ঘামতে থাকবে। সেদিন আল্লাহ তায়ালার আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।

সাত শ্রেণির লোক সেদিন আরশের ছায়াতলে স্থান পাবে। এদের মধ্যে একশ্রেণি হলো সেসব ব্যক্তি যে যৌবনকালে আল্লাহর ইবাদত করেছে। হাশরের ময়দানে পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। একমাত্র হাউজে কাউছারের পানি থাকবে। আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) সেদিন তাঁর খাটি উম্মতগণকে হাউজে কাউছার থেকে পানি পান করাবেন। পাপীরা সেদিন তৃষ্ণায় নিদারুণ কষ্ট ভোগ করবে।

বস্তুত পুণ্যবানগণ হাশরের ময়দানে নানাবিধ সুবিধাজনক স্থান লাভে ধন্য হবেন। পক্ষান্তরে পাপীরা হাশরের ময়দানেই কঠোর শাস্তি ভোগ করবে।

ঙ. মিযান

মিযান অর্থ পরিমাপক যন্ত্র বা দাঁড়িপাল্লা। হাশরের ময়দানে মানুষের আমলসমূহ ওজন করার জন্য আল্লাহ তায়ালা যে পাল্লা প্রতিষ্ঠা করবেন তাকে মিযান বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থ : "আর আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব।" (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ৪৭)

মিযানের পাল্লায় মানুষের পাপ পুণ্য ওজন করা হবে। যার পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যার পাপের পাল্লা ভারী হবে সে হবে জাহান্নামি।

চ. সিরাত

সিরাত এর শাব্দিক অর্থ পথ, রাস্তা, পুল, পদ্ধতি ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় সিরাত হলো জাহান্নামের উপর স্থাপিত একটি অন্ধকার পুল। এ পুল পার হয়ে নেক আমলকারী বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আখিরাতে সকল মানুষকেই এ পুলে আরোহণ করে তা অতিক্রম করতে হবে। সিরাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, "এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।" (সূরা মার্ইয়াম, আয়াত ৭১)

এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, يُوْضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ

অর্থ : "জাহান্নামের উপর সিরাত স্থাপিত হবে।" (মুসনাদে আহমাদ)

নেক আমলকারী বান্দাগণকে মহান আল্লাহ জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। জান্নাতিগণ সিরাতের উপর দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। নেককারদের জন্য তাঁদের আমল অনুসারে সিরাত প্রশস্ত হবে। ইমানদারগণ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী সিরাত অতিক্রম করবেন। কেউ বিদ্যুৎগতিতে, কেউ ঝড়ের গতিতে, কেউ ঘোড়ার গতিতে, কেউবা দৌড়ের গতিতে, কেউ হেঁটে হেঁটে আবার কেউ কেউ হামাগুড়ি দিয়ে সিরাত পার হবেন।

সিরাত হলো অন্ধকার পুল। সেখানে মুমিন ও নেক আমলকারী ব্যক্তির জন্য আলোর ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু যারা ইমানদার নয় এবং পাপী তাদের জন্য কোনো আলোর ব্যবস্থা থাকবে না। সুতরাং দুনিয়ায় যে দৃঢ় ইমান ও বেশি নেক আমলের অধিকারী সিরাত তাঁর জন্য সবচেয়ে বেশি আলোকিত হবে। ইমানের আলোতে সে সহজেই সিরাত অতিক্রম করবে।

অন্যদিকে যারা ইমানদার নয় এবং পাপী মহান আল্লাহ তাদের জাহান্নামে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন। জাহান্নামিদের জন্য সিরাত অত্যন্ত ভয়াবহ স্থান। তাদের জন্য সিরাত হবে চুলের চাইতেও সূক্ষ্ম এবং তরবারি অপেক্ষা ধারালো। এ অবস্থায় সিরাতে আরোহণ করে তারা কিছুতেই তা অতিক্রম করতে পারবে না। বরং তারা করুণভাবে জাহান্নামে পতিত হবে।

অতএব, আমরা সিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করব। সহজে সিরাত অতিক্রম করার জন্য প্রকৃত ইমানদার হব এবং সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ বর্জন করে অধিক পরিমাণে নেক আমল করব। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা করব।

ছ. শাফাআত

শাফাআত শব্দের অর্থ সুপারিশ করা, অনুরোধ করা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় কল্যাণ ও ক্ষমার জন্য

আল্লাহ তায়ালার নিকট নবি-রাসুল ও নেক বান্দাগণের সুপারিশ করাকে শাফাআত বলে ।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা মানুষের সকল কাজকর্মের হিসাব নেবেন । তারপর আমল অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারণ করবেন । তখন মহান আল্লাহ পুণ্যবানগণকে জান্নাতে ও পাপীদের জাহান্নামে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন । নবি-রাসুল ও পুণ্যবান বান্দাগণ এ সময় আল্লাহর দরবারে শাফাআত করবেন । ফলে অনেক পাপীকে মাফ করা হবে । এরপর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে ।

আবার অনেক পুণ্যবানের জন্যও এদিন শাফাআত করা হবে । ফলে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে ।

কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে এক বিশাল ময়দানে সমবেত করা হবে । সেদিন সূর্য খুব নিকটবর্তী হবে । মানুষ অসহনীয় দুঃখ-কষ্টে নিপতিত থাকবে । এ সময় তারা হযরত আদম (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহিম (আ.), হযরত মুসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে হিসাব-নিকাশ শুরু করার জন্য আল্লাহর নিকট শাফাআত করতে অনুরোধ করবে । তাঁরা সকলেই অপারগতা প্রকাশ করবেন । এ অবস্থায় সকল মানুষ মহানবি (স.)-এর নিকট উপস্থিত হবে । তখন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করবেন ।

অন্যদিকে কিয়ামতের দিন পাপীদের ক্ষমা ও পুণ্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শাফাআত করা হবে । নবি-রাসুল, ফেরেশতা, শহিদ, আলেম, হাফিয এ শাফাআতের সুযোগ পাবেন । আল-কুরআন ও সিয়াম (রোযা) কিয়ামতের দিন শাফাআত করবে বলেও হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে ।

কিয়ামতের দিন নবি-রাসুল ও নেক বান্দাগণ আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন । আল্লাহ তায়ালা এসব শাফাআত কবুল করবেন এবং বহু মানুষকে জান্নাত দান করবেন । তবে শাফাআতের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা থাকবে আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অধিকারে । তিনি নিজেই বলেছেন- أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ

অর্থ : "আমাকে শাফাআত (করার অধিকার) দেওয়া হয়েছে ।" (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

অন্য একটি হাদিসে রাসুল (স.) বলেছেন- "পৃথিবীতে যত ইট ও পাথর আছে, আমি তার চেয়েও বেশি লোকের জন্য কিয়ামতের দিন শাফাআত করব ।" (মুসনাদে আহমাদ)

শাফাআত একটি বিরাট নিয়ামত । মহানবি (স.)-এর শাফাআত ব্যতীত কিয়ামতের দিন সফলতা, কল্যাণ ও জান্নাত লাভ করা সম্ভব হবে না ।

অতএব, আমরা শাফাআতে বিশ্বাস স্থাপন করব । আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.)-কে ভালোবাসব । আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.)-এর আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনা করব । তাহলে পরকালে আমরা প্রিয়নবি (স.)-এর শাফাআত লাভে ধন্য হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব ।

জ. জান্নাত

জান্নাত অর্থ উদ্যান, বাগান, সুশোভিত কানন । ইসলামি পরিভাষায় পরকালীন জীবনে পুণ্যবানগণের জন্য পুরস্কার স্বরূপ যে আরামদায়ক স্থান তৈরি করে রাখা হয়েছে তাকে বলা হয় জান্নাত ।

জান্নাতে সবধরনের নিয়ামত বিদ্যমান । মুমিনগণ সেখানে চিরকাল অবস্থান করবেন । তাঁরা সেখানে তাঁদের পুণ্যবান মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মিলিত হবেন । তাঁরা যা চাইবেন তাই সাথে সাথে লাভ করবেন । আল্লাহ তায়ালা বলেন, "সেখানে (জান্নাতে) তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ কর । এটি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন ।" (সূরা হা-মিম আস-সাজদা, আয়াত ৩১-৩২)

বস্তুত জান্নাতের সুখ-শান্তি ও নিয়ামত অফুরন্ত। এর বর্ণনা শেষ করা যায় না। একটি হাদিসে কুদসিতে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য (জান্নাতে) এমন সব নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান কোনোদিন তা শুনেনি এবং কোনো মানব হৃদয় কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।" (সহিহ বুখারি)

আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য আটটি জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন। এগুলো হলো- (১) জান্নাতুল ফিরদাউস, (২) দারুল মাকাম, (৩) দারুল কারার, (৪) দারুস্‌সালাম, (৫) জান্নাতুল মাওয়া, (৬) জান্নাতুল আদন, (৭) দারুন নাইম ও (৮) দারুল খুলদ।

জান্নাত চরম সুখের আবাস। দুনিয়াতে যারা ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করে চলবে তারা পরকালে জান্নাত লাভ করবে। সকল কাজকর্মে আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করলে জান্নাত লাভ করা সম্ভব হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۙ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ۙ

অর্থ : "আর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে জান্নাতই হবে তার আবাস।" (সূরা আন-নাযিআত, আয়াত ৪০-৪১)

সুতরাং আমরাও জান্নাত লাভের জন্য সদা সর্বদা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করব, তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলব, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করে উত্তম চরিত্র গঠন করব। তাহলে মহান আল্লাহ আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন, আমরা পরকালে জান্নাত লাভ করব।

ঝ. জাহান্নাম

জাহান্নাম হলো শাস্তির স্থান। পরকালে মুমিনগণের জন্য যেমন জান্নাতের ব্যবস্থা রয়েছে তেমনি পাপীদের জন্য রয়েছে শাস্তির স্থান। আর জাহান্নামই হলো সে শাস্তির জায়গা। জাহান্নামকে نَارٌ (নার) বা আগুনও বলা হয়।

জাহান্নাম চির শাস্তির স্থান। এর শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। মানুষের পাপের পরিমাণ অনুসারে শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। জাহান্নামের আগুন অত্যন্ত উত্তপ্ত। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

نَارُكُمْ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ

অর্থ : "তোমাদের এ পৃথিবীর আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র।" (সহিহ বুখারি)

এ আগুনে মানুষের হাড়, চামড়া, গোশত সবকিছুই পুড়ে যাবে। কিন্তু তাতে তার মৃত্যু হবে না। বরং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে পুনরায় তার দেহ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। পুনরায় তা পুড়ে দগ্ধ হবে। এভাবে পুনঃপুনঃ চলতে থাকবে।

জাহান্নাম বিষাক্ত সাপ, বিচ্ছুর আবাসস্থল। সেখানকার খাদ্য হলো বড় বড় কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ। উত্তপ্ত রক্ত ও পুঁজ হবে জাহান্নামিদের পানীয়। মোটকথা জাহান্নাম অতি যন্ত্রণাদায়ক স্থান। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যারা কুফরি করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, ফলে তাতে তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত হয়ে যাবে, আর তাদের জন্য থাকবে লৌহমুদগর। যখনই তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর তাদের বলা

হবে, আস্বাদন কর দহন-যন্ত্রণা।" (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ১৯-২২)

পাপীদের শাস্তি দানের জন্য আল্লাহ তায়ালা ৭টি দোযখ তৈরি করে রেখেছেন। এগুলো হলো- (১) জাহান্নাম, (২) হাবিয়া, (৩) জাহিম, (৪) সাকার, (৫) সাইর, (৬) হুতামাহ এবং (৭) লাযা।

জাহান্নাম হলো ভীষণ শাস্তির স্থান। কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা তথায় চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَأَمَّا مَنْ طَغٰى ۝ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى ۝

অর্থ : "অনন্তর যে সীমালঙ্ঘন করে এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয় জাহান্নামই হবে তার আবাস।" (সূরা আন-নাযিআত, আয়াত ৩৭-৩৯)

যাদের ইমান রয়েছে কিন্তু পাপের পরিমাণ বেশি এমন মুমিনরাও জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। তবে তাদের পাপের শাস্তি শেষ হওয়ার পর তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।

আমরা সব রকম পাপ থেকে মুক্ত থাকব। খাঁটি ইমানদার হব। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আনুগত্য করব। তাহলেই জাহান্নামের আগুন ও শাস্তি থেকে আমরা রেহাই পাব।

কাজ : শিক্ষার্থী আখিরাতের জীবনের স্তরগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ১৫

সৎকর্মশীল ও নৈতিকজীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা

আখিরাত হলো পরকাল। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলা হয়। আখিরাত হলো মানুষের অনন্ত জীবন। এটি চিরস্থায়ী। পক্ষান্তরে দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। বস্তুত দুনিয়ার জীবন হলো আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্র। বলা হয়েছে- اَلدُّنْيَاءُ مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ

অর্থ : "দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।" (প্রবাদ)

মানুষ শস্যক্ষেত্রে যেরূপ চাষাবাদ করে, বীজ বপন করে, যেভাবে পরিচর্যা করে; ঠিক সেরূপই ফল লাভ করে। যদি কোনো ব্যক্তি তার শস্যক্ষেত্রের পরিচর্যা না করে তবে সে ভালো ফসল লাভ করে না। তদ্রূপ দুনিয়ার কাজকর্মের প্রতিদান আখিরাতে দেওয়া হবে। দুনিয়াতে ভালো কাজ করলে আখিরাতে মানুষ পুরস্কৃত হবে। আর মন্দ কাজ করলে শাস্তি ভোগ করবে।

কবর, হাশর, মিযান, সিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি আখিরাত জীবনের এক একটি পর্যায়। ইসলামি বিশ্বাস মোতাবেক, যে ব্যক্তি ইমান আনে, সৎকর্ম করে সে আখিরাতে শান্তিময় জীবন লাভ করবে। কবর থেকে শুরু করে আখিরাতের প্রতিটি পর্যায়ে সে সুখ, শান্তি ও সফলতা লাভ করবে। অন্যদিকে দুনিয়াতে যে ব্যক্তি অবাধ্য হবে, পাপাচার করবে সে আখিরাতের সকল পর্যায়ে কষ্ট ভোগ করবে। তার স্থান হবে জাহান্নাম।

মানবজীবন গঠনের জন্য আখিরাতে বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে জীবন পরিচালনায়

নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করতে বাধ্য করে। যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে সে প্রত্যহ তার প্রতিটি কাজের হিসাব নিজেই নিয়ে থাকে। এভাবে দৈনন্দিন আত্মসমালোচনার মাধ্যমে মানুষ তার ভুল-ত্রুটি শোধরিয়ে নিয়ে সৎচরিত্রবান হিসেবে গড়ে ওঠে।

আখিরাতে পুণ্যবানকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করানো হবে। জান্নাত হলো চিরশান্তির স্থান। জান্নাত লাভের আশা মানুষকে দুনিয়ার জীবনে সৎকর্মশীল করে তোলে। মানুষ জান্নাত ও তার নিয়ামত প্রাপ্তির আশায় নেক আমল করে, ভালো কাজ করতে উৎসাহিত হয়। কেননা আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা ও সৎকর্ম ব্যতীত জান্নাত লাভ করা যায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝

অর্থ : "নিশ্চয়ই যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। এটাই মহাসাফল্য।" (সূরা আল-বুরূজ, আয়াত ১১)

এভাবে পরকালীন জীবনে জান্নাত লাভের আশা মানুষকে সৎকর্মশীল হতে সাহায্য করে।

জাহান্নাম অতি কষ্টের স্থান। এতে রয়েছে সাপ, বিচ্ছু ও আগুনের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। দুনিয়ার জীবনের পাপী, অবাধ্য ও মন্দ আচরণের লোকদের পরকালে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۝ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

অর্থ : "অনন্তর যে সীমালঙ্ঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় জাহান্নামই হবে তার আবাস।" (সূরা আন-নাযিআত, আয়াত ৩৭-৩৯)

জাহান্নামের শাস্তির ভয়ও মানুষকে অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে। দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার আদেশ না মানা, পার্থিব লোভ লালসার বশবর্তী হয়ে অন্যায় অনৈতিক কাজ করা ইত্যাদি জাহান্নামিদের কাজ। সুতরাং জাহান্নামের ভয়ে মানুষ এসব কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে।

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে বড় বড় অন্যায় এবং অনৈতিক কাজের পাশাপাশি ছোট ছোট পাপ ও অসৎ কাজ থেকেও বিরত রাখে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

অর্থ : "কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলেও তা সে দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখবে।" (সূরা আল-যিলযাল, আয়াত ৭-৮)

আল্লাহ তায়ালা পরকালে মানুষের সামান্যতম ভালো বা মন্দ কাজ সবই প্রদর্শন করবেন। অতঃপর এগুলোর পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হবে। সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে ছোট-বড়, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব ধরনের অন্যায় থেকে বিরত রাখে এবং পাপমুক্ত, সৎকর্মশীল ও নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

আমরা আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করব এবং এ বিশ্বাসের আলোকে ইহকালে আমাদের জীবনকে পাপমুক্ত রাখব, সৎকর্মশীল হব এবং নৈতিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হব।

কাজ : শিক্ষার্থী 'সৎকর্মশীল হতে ও নৈতিক জীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা' সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আসমানি কিতাবে বিশ্বাসের গুরুত্ব সংক্ষেপে লেখ ।

২. 'প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে'– বুঝিয়ে লেখ ।

৩. সংক্ষেপে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধর ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. নৈতিক জীবনে আসমানি কিতাবের ভূমিকা বিষয়ক একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লেখ ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসকে কী বলা হয়?

ক. ইমান খ. ইসলাম

গ. ইহ্সান ঘ. ইনসাফ ।

২. 'আলহিকমাতু' শব্দের অর্থ কী?

ক. উপদেশ খ. প্রজ্ঞা

গ. জ্যোতি ঘ. অনুগ্রহ ।

৩. মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে অবস্থান করবে, কারণ তারা-

i. সমাজে চিহ্নিত মানুষ

ii. অন্তরে কুফর লুকিয়ে রাখে

iii. কাফিরদের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে এ পর্যন্ত সূর্যের উদয় ও অস্ত যাওয়ার পদ্ধতি একই নিয়মে চলে আসছে। এ অবস্থা দেখে সুলতান সাহেব মনে করেন, পৃথিবী আর ধ্বংস হবে না।

৪. সুলতান সাহেব আখিরাতের কোন বিষয়টিকে অস্বীকার করেন?

ক. কবর খ. হাশর

গ. কিয়ামত ঘ. মিযান

৫. সুলতান সাহেবের ধারণার ফলে, তাকে বলা যায়–

ক. কাফির খ. মুশরিক

গ. ফাসিক ঘ. মুনাফিক

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফরিদ ও সেলিম সহপাঠী। তারা উভয়ে আগামীকাল ৯.০০ ঘটিকায় বিদ্যালয়ে আসবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। পরদিন সেলিম নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকলেও ফরিদ বিদ্যালয়ে যথাসময়ে আসেনি। বেলা ১১.০০ ঘটিকায় তার সাথে দেখা হলে সে বলে আমি তো তোমার সাথে ঠাট্টা করেছি। এরপর দুইজন মিলে ক্যান্টিনে গিয়ে খেতে বসল। খাওয়ার পর তারা দেখল জনৈক ব্যক্তি কিছু তরল নেশাজাতীয় দ্রব্য পান করছে। ফরিদ ঐ ব্যক্তিকে নিষেধ করতে চাইলে সেলিম তাকে বিরত রেখে বলল, 'এতে দোষের কিছু নেই।'

ক. ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলো অস্বীকার করাকে কী বলে?

খ. আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য কেন?

গ. ফরিদের আচরণে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সেলিমের বক্তব্য ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ কর।

২. **প্রেক্ষাপট-১**

আদ্যক্ষর সু নামক প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকর্তার পেশাগত প্রশিক্ষণ, এমনকি ডিপ্লোমা সনদ নেই। তারপরও তাঁরা চিকিৎসক ও সেবিকা সেজে স্পর্শকাতর পরীক্ষা চালাচ্ছেন ও লোকজনকে টিকা দিচ্ছেন। এই সুযোগে তাঁরা হাজার হাজার টাকা কামিয়ে নিচ্ছেন। (সংক্ষেপিত : প্রথম আলো, ০৫ জুলাই ২০১২)

প্রেক্ষাপট-২

অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার এভাবে বাড়তে থাকলে খুব শীঘ্রই মানবজাতি জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রাণরক্ষার যুদ্ধে পরাস্ত হবে। গৃহপালিত পশুপাখিকে রোগমুক্ত রেখে কম সময়ে অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে অ্যান্টিবায়োটিকের অবাধ ব্যবহার হয়ে আসছে। পোলট্রিতে উৎপাদন বাড়াতে অর্থাৎ পোলট্রির দৈহিক বৃদ্ধির জন্য অনেক খামারি গ্রোথ প্রোমোটার হিসেবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে। অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগকৃত ডিমে প্রায় ৩০০ মাইক্রোগ্রাম কোলেস্টেরল পাওয়া যায়, যা হৃদরোগীর জন্য খুবই ক্ষতিকর। (যুগান্তর ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১২, সংক্ষেপিত)

ক. আল্লাহর নিকট একমাত্র জীবন ব্যবস্থা কী?

খ. 'তাওহিদের স্বরূপ' ব্যাখ্যা কর।

গ. ১ নম্বর প্রেক্ষাপটে কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ২ নম্বর প্রেক্ষাপটে যে বিষয়টি ফুটে ওঠে, তা 'সৎকর্মশীল হতে ও নৈতিক জীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা'র আলোকে বিশ্লেষণ কর।